সতী

রিক্সা দু'টি গলির মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র একটা চাপা চাঞ্চল্যের ঢেউ খেলে গেল চূনবালিখসা ইঁট বারকরা বাড়িগুলোর বাসিন্দাদের মধ্যে। ঝুল-বারান্দা এবং খোলা জানলা দিয়ে উৎসুখ কতগুলো মুখ উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। দরজা খুলে শশব্যস্তে রাস্তায় নেমে এল কেউ কেউ। রিক্সা ততক্ষণে একটা হলদে বাড়ির সামনে এসে থেমেছে।

পিছনের রিক্সা থেকে দুটি ছোকরা নেমে সামনের রিক্সার কাছে এগিয়ে এসে নরম গলায় বললো, "নামুন বৌদি।"

বৌদি অর্থাৎ তপতী ইঙ্গিতে প্রৌঢ়া শাশুড়িকে দেখিয়ে বললো, "মাকে একটু ধরুন।"

ছেলে দুটি শশীবালাকে সযত্নে নামাতেই তিনি একটি ছেলের কাঁধে মাথা রেখে সজোরে কেঁদে উঠলেন। ততক্ষণে পাড়াপ্রতিবেশীরা অনেকেই জমায়েত হয়েছে সেখানে। কয়েকজন মহিলা শশীবালাকে ধরাধরি করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল।

পরমুহূর্তে বাড়ির ভিতর থেকে তাদের ব্যস্ত কণ্ঠ শোনা গেল, "ওরে মাসিমা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। শীগ্‌গির পাখা আন। বুলু জল আন শীগ্‌গির।

বেশ শোরগোল পড়ে গেল সেখানে। তপতী নিস্পৃহ শুষ্ক মুখে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলো। খানিক পরে উঠোন পার হয়ে কলঘরে ঢুকতে দেখা গেল তাকে এবং পরক্ষণে কলঘর থেকে অবিশ্রান্ত জলের আওয়াজ ভেসে এলো।

শশীবালাকে ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে ভিতরের বারান্দায়। মেঝের উপর তাঁকে শুইয়ে মুখে মাথায় জল ঝাপ্টা দিচ্ছে কেউ। কেউ পাখা নাড়ছে। নানাবিধ উপদেশ-নির্দেশ দিচ্ছে অন্যেরা। সবারই চেহারায় উৎকণ্ঠা আর সহানুভূতির সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে।

এবং তা খুবই স্বাভাবিক। বিধবা শশীবালার সুস্থ সবল যুবক পুত্রটি হঠাৎ কোন এক দুর্ধর্ষ ভাইরাসের শিকার হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ আটদিন নানাবিধ চিকিৎসায় উপসম হওয়ার বদলে রোগ আরও জটিলতর হয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে শশাঙ্ককে এবং পাড়ার ডাক্তারের কথামত কাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছে সে।

হাসপাতালের ডাক্তাররা রুগীর অবস্থা দেখে তাকে তক্ষুণি ইন্‌টেন্‌সিভ্‌ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করে নিয়েছেন এবং রুগীর সহচরদের অনেক বকাবকি করেছেন এত দেরী করে ফেলার জন্যে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। ডি আই লিস্টে নাম উঠে গেছে শশাঙ্কের এবং ডাক্তারেরা আশঙ্কা করছেন যে অদ্যই তার শেষ রজনী। পাড়ার যে ছোকরা দুটি শশাঙ্কের স্ত্রী এবং জননীকে সঙ্গে করে হাসপাতালে নিয়ে গেছিল তারাই এই বার্তা বহন করে এনেছে।

সরকারী হাসপাতাল। বারো ভূতের রাজ্য। সেখানে এই দু'টি শোকসন্তপ্তা মহিলাকে দেখার সময় নেই কারও। বিশেষত শশীবালা মুহুর্মুহু ফিট হচ্ছেন। ডাক্তার রুগী নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। রুগীর আত্মীয়েরা ভিড় করলে চলবে কেন। পাড়ার ছেলেরা পালা করে হাসপাতালে থাকবে. শশাঙ্কের খবরাখবর রাখবে তারাই। মহিলারা বাড়িতেই থাকুন। পাড়াপ্রতিবেশিনীরা এ ব্যবস্থায় একবাক্যে রায় দিলেন। এদিকটা তাঁরাই দেখবেন। রান্নাবান্নার পাট এ বাড়িতে ক'দিন থেকে বন্ধ। পাড়ার লোকেই সামাল দিচ্ছে সব।

পাশের বাড়ির বুলু কোন ফাঁকে বেরিয়ে গিয়েছিল। পাথরের বড় একটা গেলাস হাতে ফিরে এলো। নির্বাক শশীবালা বিহ্বল শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন।

বুলু ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এসে গেলাসটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "মাসিমা এই বেলের পানাটুকু খেয়ে নিন।"

শশীবালা উত্তর দিলেন না। তাঁর দুই চোখ দিয়ে দরদর করে জলের ধারা নেমে এলো।

বুলু নিজের শাড়ির খুঁট দিয়ে তাঁর চোখ মুছে দিয়ে বললো, "ভগবানের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিন মাসিমা। তাঁর ইচ্ছের উপর তো

আমাদের হাত নেই।"

গেলাসটি শশীবালার হাতে তুলে দিয়ে তাঁর পিঠে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে নানা মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তাঁকে বেলের পানাটুকু খাওয়ালো বুলু।

বুলু শশাঙ্কের ছোট বোন শুভ্রার বান্ধবী। বছর দুয়েক আগে শুভ্রার বিয়ে হয়ে গেছে। সে এখন ভাগলপুরে, তার শ্বশুরালয়ে। বুলু এখনও অনূঢ়া। এ বাড়িতে তার অবাধ গতিবিধি। তপতী এ বাড়িতে বধূরূপে আসার পর তার সঙ্গেও সখ্যতার বন্ধন গড়ে উঠেছে বুলুর। তার দেড় বছরের কন্যা পারুল তো বুলুমাসি বলতে অজ্ঞান। শশাঙ্কের সঙ্কটজনক অবস্থা এ সংসারটিকে বিষাদ এবং উৎকণ্ঠায় ম্লান মুমূর্ষ করে দিতে বুলু ছোট্ট পারুলকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে তুলেছে। শশীবালা ও তপতী সকৃতজ্ঞ চিত্তে সায় দিয়েছেন এ ব্যবস্থায়।

বেলের পানা পান করে শশীবালা স্থবিরের মত বসে রইলেন। অকস্মাত আঘাত যেন হতজ্ঞান জড়পদার্থে পরিণত করেছে তাঁকে। কিংবা, অজগরের মুখে প্রবিষ্ট হবার আগে ভীরু খরগোস যেমন গতি, বুদ্ধি, চেতনাভ্রষ্ট হয়ে পড়ে উনিও তেমনি পঙ্গু অসহায় হয়ে ভাগ্যদেবতার আশু নির্মম প্রহারের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন রক্তাক্ত হৃদয়ে।

উপস্থিত জনসমষ্টির মধ্যে কেউ নীচু গলায় মন্তব্য করলো, "শুভ্রাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। সলিলকে নিয়ে এসে পড়ুক পত্রপাঠ।"

সবাই একবাক্যে সমর্থন জানালো। বৃদ্ধামাতা, যুবতী স্ত্রী আর অবোধ শিশুকন্যা সম্বলিত সংসারের যে খুঁটি, যাকে আশ্রয় করে এদের জীবন, সেই গৃহকর্তা শশাঙ্ক নিজেই গতপ্রায়। ভালমন্দ কিছু একটা ঘটে গেলে - এবং কিছু একটা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা পুরোমাত্রায় বর্তমান - সবদিক সামাল দেবার মত একজন কর্তাব্যক্তির অভাব। সলিলের উপস্থিতি এসময়ে অত্যন্ত আবশ্যক।

"কালই টেলিগ্রাম পাঠানো উচিত ছিল। হাসপাতালে ভর্তি করেই।" রায় দিলেন একজন।

"গতস্য শোচনা নাস্তি। বেটার লেট দ্যান নেভার। এক্ষুণি সাইকেল

চেপে চলে যাক কেউ।"

"ওই ভবতোষকেই পাঠিয়ে দেওয়া হোক। ছোকরা চটপটে আছে।"

"কি লিখবে টেলিগ্রামে?"

"কি আবার ! যা লেখে এক্ষেত্রে।"

"ঠিকানাটা জানেন? সলিলের ঠিকানা?"

চাপা শলাপরামর্শ স্থগিত রেখে শশীবালার দিকে তাকায় সবাই। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে স্থানুর মত বসে আছেন। দুচোখ বন্ধ। থেকে থেকে ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

"আহা, মায়ের প্রাণ !" দীর্ঘশ্বাস চেপে মৃদু মন্তব্য করে কেউ।

এবং সেকথা শুনে কেন জানি সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে উঠোনের ওপাশে বাথরুমের দিকে দৃষ্টি চালিয়ে দেয়। বালতিতে জল পড়ার আওয়াজ একইভাবে শোনা যাচ্ছে এখনও। প্রতিবেশিনীদের ঠোঁটের কোণে অনুচ্চারিত বক্রোক্তির ক্ষীণ শ্লেষ রেখা ফুটে ওঠে। অতবড় দুঃসংবাদটা শুনেও তপতীর শুচি-জ্ঞান টনটনে আছে, এবং সর্বাগ্রে হাসপাতালের কাপড় ছেড়ে স্নান করতে ছুটেছে সে। সবার চোখেই বিসদৃশ লাগে ব্যাপারটা এবং এই একটা ব্যাপারই যেন চোখে আঙুল দিয়ে জননী এবং প্রেয়সীর দ্বিবিধ প্রেমের পার্থক্যটা হাড়ে হাড়ে চিনিয়ে দেয় তাদের।

"সলিলের ঠিকানাটা ?" ভবতোষ প্রশ্ন করে আবার।

বুলু ভিতর-বাড়ি থেকে একটা মাদুর আর ছোট বালিশ নিয়ে বেরিয়ে এলো।

ভবতোষের প্রশ্ন শুনে বললো, "কার ঠিকানা? শুভ্রার? আমি জানি। ও তো প্রায়ই চিঠি লেখে আমাকে। এসো দিচ্ছি।"

ভবতোষকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়ায় বুলু। ভবতোষ ঠিকানা সংগ্রহ করে সাইকেল নিয়ে পোস্টঅফিস রওনা দিলো।

বুলুর মা পারুলকে নিয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছিলেন। বাড়ি যাবার জন্যে বায়না ধরেছে সে। ভীষণ কান্নাকাটি করছে। বুলু পারুলকে কোলে তুলে নিয়ে মাকে নিম্নসুরে বললো, "আমি একে দেখছি। তুমি ঘুরে এসো।

মাসিমাকে শুইয়ে দাও। বৌদিরও কিছু খাওয়া দরকার। রাত্রে ওখানে কে থাকছে জেনে এসো। দরকার হলে আমি থাকতে পারি।"

মা বললেন, "তোমার আর ওখানে থেকে কাজ নেই। এই দুধের মেয়েটাকে সামলাবে কে? রাত দুপুরে উঠে ডাক ছেড়ে কান্না জুড়লেই গেছি আমি। মাসিঅন্ত প্রাণ, মাসি তো বাড়িতে এনেই খালাস, একটু কোলেও নেয় না।"

বুলু পারুলের গালে সশব্দে চুমু দিয়ে বললো, "তাই নাকি গো পারুলসোনা? বেশ মাসি এবার থেকে তোমার কাছেই থাকবে, কেমন?"

এক বাটি দুধভাত মেখে পারুলকে কোলে নিয়ে ছাদে উঠলো বুলু। নানান অছিলায় ভুলিয়েভালিয়ে সবটুকু দুধভাত খাওয়ালো। তারপর তাকে ঘুম পাড়ানোর প্রচেষ্টায় লাগলো।

পাশে শশাঙ্কদের বাড়িতে তখনো লোকজনের আসা-যাওয়া চাপা গুঞ্জন চলছে। ছাদে বসে আবছা আওয়াজ পাচ্ছে বুলু। ও ছাদের অন্য প্রান্তে বসেছে, পাছে নিজেদের বাড়ি দেখতে পেয়ে পারুলের শিশুমনে আবার বাড়ি যাবার ইচ্ছা জেগে ওঠে। খানিক পরেই পারুল ঘুমিয়ে পড়লো। বুলু ওকে কোলে শুইয়ে ধীরে ধীরে দোলা দিতে থাকলো। ঘুমটা একটু গাঢ় হলেই নীচে গিয়ে বিছনায় শুইয়ে দেবে।

হঠাৎ বুলুর মনে হল ও বাড়িতে শোরগোলটা যেন বড্ড চড়াগ্রামে উঠেছে। ভারি বিরক্ত হল বুলু। শোকদুঃখের বাড়ি ভিড় করে উৎপাত করার কোন মানে হয় না। দুঃখিনী দু'জন অতন্দ্র অভুক্ত কাটিয়েছে কতদিন প্রিয় পুত্র ও স্বামীর রোগশয্যাপাশে সজাগ প্রহরায়। রাত্রিশেষে যে দুঃসহ শেলাঘাত অপেক্ষা করছে তা উপলব্ধি ও সহ্য করার শক্তি ও বোধটুকুও লোপ পেয়ে যাবে তাদের যদি না সেই আঘাত আসার পূর্বমুহূর্তে এখন একটু আহার-বিশ্রামে বাধ্য করে সমবেত সমব্যথীরা। পরিবর্তে সবাই মিলে যদি ওখানে আস্তানা গেড়ে ওদের শোকটাকে ঢালাও আড্ডার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে তবে সেটা দারুণ অবিবেচনা ও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক।

পারুলকে বিছানায় শুইয়ে মশারী গুঁজে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সে। পাশের বাড়ির চাঞ্চল্যকর আবহাওয়াটা একটা নতুন রূপ

নিয়েছে বলে মনে হল বুলুর। তবে কি হাসপাতাল থেকে খবর এসে গেছে ! ডাক্তারের আশঙ্কা সত্যি হয়েছে ! শশাঙ্ক কি শ্মশানের অঙ্কে বিলুপ্ত হবে এবার !

ভবতোষ ব্যস্তভাবে পথে নামতেই বুলু বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে ডাক দিলো, "ও ভবতোষদা শুনে যাও। কি হয়েছে?"

ভবতোষ উত্তেজিতভাবে বললো, "পুলিস ডাকতে যাচ্ছি।"

তারপর সাইকেলে চড়ে সটান রাস্তার মোড়ে মিলিয়ে গেল।

শুভ্রা ট্রেনে সমস্তক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে এসেছে। রিক্সা গলির মোড়ে ঢুকতেই ভয়ে ওর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো।

"হে ঠাকুর, হে মধুসূদন দাদাকে বাঁচিয়ে রেখো। দাদাকে যেন জীবন্ত দেখতে পাই ঠাকুর।"

রিক্সা ভাল করে থামার আগেই শুভ্রা হুড়মুড় করে নেবে পড়লো। নাইলনের শাড়ি ভ্যাচ্ করে ছিঁড়ে গেল অনেকখানি। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে পাগলের মত এগিয়ে গেল তার অতি প্রিয় পুরোনো পিত্রালয়ের দিকে। বাড়ির সামনে বহু লোকের ভীড়। ধরাধরি করে চাদরঢাকা একটি শবদেহ বার করছে ওরা। ফুল ধূপধুনো চন্দনের মিষ্টি গন্ধে মিষ্টি হয়ে আছে চারিধার।

"দাদা, দাদা গো!" শুভ্রা আছড়ে পড়লো শবদেহের আচ্ছাদনের উপর।

আচ্ছাদন সরে গিয়ে একজোড়া আলতাপরা পা দৃষ্টিগোচর হল। কান্না থামিয়ে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো শুভ্রা। সলিলও।

মেয়ের সাড়া পায়ে শশীবীলা দুর্বল অবসন্ন পায়ে ধীরে ধীরে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। শুভ্রা মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো।

শশীবালা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "ওরে সাবি তোর বৌদি আর নেই রে। সতীলক্ষ্মী বউমা নিজের প্রাণ দিয়ে যমের দোর থেকে আমার শঙ্কুকে ফিরিয়ে এনেছে।"

মেয়ের কাঁধে মাথা রেখে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। দু'দিনের বাসি মড়া। পরশু হাসপাতালে ডাক্তারের মুখে চরম রায় শুনে এসে

তপতী সেই যে বাথরুমে ঢুকলো, আর বেরোয়নি। সেখানেই আত্মঘাতী হয়েছে। সে রাতে তার সৎকারের ব্যবস্থা হয়নি কারণ শশাঙ্কের জীবন সম্বন্ধেও শঙ্কা ছিল। শঙ্কা কেন তার মৃত্যুও প্রায় ধ্রুব নিশ্চয় বলে ধরে নিয়েছিল সবাই। তাই আলাদা করে সাততাড়াতাড়ি তপতীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেরে ফেলার বদলে শশাঙ্কের জন্য অপেক্ষা করাই সুবিবেচনার কাজ বলে মনে করেছে সকলে। পতিবিয়োগের আতঙ্কেই যখন প্রাণ দিয়েছে মেয়েটা, পতির বুকে মাথা রেখে একই চিতাগ্নিতে শেষ হোক তার মরদেহ। ইহলোক পরলোক কোথাও যেন বিচ্ছেদ না ঘটে আর।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর। এখানে মড়া আগলে বসে রয়েছে সকলে। মহা তোড়জোড় সহ শবযাত্রার সাজসরঞ্জাম রেডী হচ্ছে। তপতীকে বধূবেশে সাজানো হয়েছে। ফুলের কঙ্কণে, হারে, বেণীবন্ধে। সিঁদুর আলতা চন্দনে। এয়োস্ত্রীরা বরণডালা সাজিয়ে প্রদক্ষিণ করছে ভক্তিভরে। সতীর আলতামাখা পায়ের ছাপ নিয়েছে, নিয়েছে চন্দনসিক্ত করপল্লবের পবিত্র পরশ; তারপর ভবতোষকে হাসপাতালে খবর সংগ্রহার্থে পাঠিয়ে অধীর উৎসুকতায় অপেক্ষা করছে সবাই। কিন্তু প্রতীক্ষিত খবরের বদলে ভবতোষ যা বার্তা আনলো তা সত্যিই বিস্ময়কর।

শশাঙ্কের জীবনাবসান আশু এবং অনিবার্য স্থির করে ডাক্তারেরা নেহাতই মরীয়া হয়ে শেষ চেষ্টা রূপে বিদেশাগত এক নতুন দাওয়াই ছেড়েছিলেন তার উপর। সেই ওষুধে নাকি অলৌকিক ফললাভ হয়েছে। মৃতপ্রায় শশাঙ্কের অবস্থার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে এবং এযাত্রার মত তার কালযাত্রা রদ হল বলেই মনে করেন হাসপাতালের বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা। অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাকে একটু ভাল করে দানা বাঁধার সময় দিতে এবং একেবারে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে এরা কালকের দিনটাও দাহকার্য স্থগিত রাখলো। কিন্তু আর দেরি করা চলে না। দেরি করে লাভও নেই কিছু। এইমাত্র ভবতোষ শেষতম সংবাদ এনেছে যে শশাঙ্ক ডি.আই. লিস্ট ছেড়ে সাধারণ রুগীর পর্যায়ে নেমে এসেছে। এসবই যে করুণাময়ী সতীলক্ষ্মীর শক্তি ও দাক্ষিণ্যের জ্বাজ্জ্বল্য প্রমাণ সে বিষয়ে সন্দেহের বাষ্পমাত্র থাকে না কারও।

মহাসমারোহে তপতীর শেষ কার্য সম্পন্ন হল। শুভ্রা ও সলিল ভাগলপুরে ফিরে গেল। শশাঙ্ককে আরও কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। যা একটা ফাঁড়া গেছে তাতে একেবারে সুস্থসবল না হয়ে ওঠা অবধি তাকে বাড়ি আনতে সাহস পাননি শশীবালা। ডাক্তাররাও অমত করেছেন। তাছাড়া বাড়ি এলেই স্ত্রীবিয়োগের ব্যথাটা আরও বেশী করে বাজবে তাকে, চারিদিকে শতস্মৃতি কাঁটার মত বিঁধবে অহরহ। তপতী যে নেই, তাকে হারানোর ব্যথা সহ্য করতে না পেরে সে আঘাত আসার আগেই নিজেকে চরম আঘাত হেনে শেষ করে দিয়েছে সে এবং তার আত্মবলির চরম মূল্যে শশাঙ্ক তার হতপ্রায় জীবন ফিরে পেয়েছে এ সংবাদটা হাসপাতালে থাকাকালেই পেয়েছে শশাঙ্ক। সংবাদটা শুনে নিথর নীরব হয়ে গেছে সে। এবং সে নিরবতার মূলে কতটা বিস্ময় কতটা অভিমান কতটাই বা দুঃসহ বেদনা তার হিসেব সে নিজেও সঠিক জানে না।

সময় কারও জন্যে থেমে থাকে না কোনদিন। চিরাচরিত ধরাবাঁধা রুটিনে ফিরে যায় সকল মানুষ দুঃখ দুর্বিপাকের আঘাত কাটিয়ে। যেমন উচ্ছল জলপ্রবাহ থেকে একঘড়া জল তুলে নিলে কোনও ফাঁক কোনও অভাব বা ক্ষতির চিহ্ন থাকে না, জলের ধারা বয়ে যায় ঠিক সমান বেগে। শশাঙ্ক নিয়মিত অফিস করে, সকালে বাজারে যায়, বিকেলে বন্ধুবান্ধবদের তাসের আড্ডায়। শশীবালাও একাদশী-পূর্ণিমা-অম্বাবুচির তিথি নির্ণয় ও নানাবিধ ব্রতপালনে নিযুক্ত রাখেন নিজেকে। পারুল আরও বড় হয়েছে এই ক'মাসে। আধো-আধো কথা বলে। দস্যিপনাও বেড়েছে। এবাড়ি সেবাড়ি করে বেড়ায় সমস্তদিন এবং এদের মধ্যে যে বাড়িটি তার সবচেয়ে প্রিয় সেটি হল বুলুদের বাড়ি। শশীবালাও প্রশ্রয় দেন এ ব্যাপারে। কারণ এ বয়সে একা হাতে ঐ দুরন্ত নাতনীটিকে সামলানো তাঁর সাধ্যাতীত।

সেদিন রবিবার। দুপুরে আহারাদির পর শশাঙ্ক বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছে। সপ্তাহান্তে একদিন কন্যার সান্নিধ্যলাভের ইচ্ছায় পারুলকে আজ সে বাড়িতে আটক রাখবে মনস্থ করেছিল কিন্তু মেয়ের বায়নার কাছে তার অভিপ্রায় টেঁকেনি। টফি-চকোলেটের প্রলোভন উপেক্ষা করে "বুলুমাসি"র জন্যে এমন চিৎকার ও ক্রন্দন জুড়েছিল যে বুলু সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেনি। খানিক আগে এসে পারুলকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গেছে। চোখের

সামনে খবরের কাগজ মেলে ধরে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন করে সেই কথাই ভাবছিল শশাঙ্ক।

শশীবালা ঘরে ঢুকলেন। একটা মোড়া টেনে নিয়ে তার উপর বসে বিনা ভূমিকায় বক্তব্য ফাঁদলেন, "এ মাস তো শেষ হতে চললো। এরপর আবার অনেকদিন ভাল দিন নেই। বুলুর মা বলছিলেন। আমি তো কথা একরকম দিয়েই রেখেছি। বললাম দিনক্ষণ ঠিক করার আগে শঙ্কুকে জিজ্ঞেস করে নিই। তোমাদের অফিসে আবার ছুটিছাটা সময় মত দেবে কিনা ----।"

শশাঙ্ক খবরের কাগজটা আরও কাছে টেনে নিল। তার মুখখানা সম্পূর্ণভাবে কাগজে ঢাকা পড়ে গেল।

শশীবালা নিজের মনে বলে চললেন, "মেয়েটাও যেন বুলুমাসি বলতে অজ্ঞান। পেটের মেয়েকেও কেউ এত যত্ন করে না। খাওয়ানো নাওয়ানো ঘুম পাড়ানো। হাজার রকম বায়না সামলানো। এতটুকু বিরক্তি দেখিনি কোনদিন। এ সবই বিধির নির্বন্ধ। উনিই সব ঠিক করে রেখেছেন। তা না হলে অমন ভাল মেয়ে এতদিন পড়ে থাকে? কত জায়গা থেকে কত সম্বন্ধ এলো গেলো, টিঁকলো না একটাও। টিকবে কি করে? ও মেয়ে যে তোর হাঁড়িতে চাল দিয়ে বসে আছে।"

শশাঙ্কের হাতের কাগজ নড়ে উঠলো। সেই আওয়াজে আকৃষ্ট হয়েই বুঝি শশীবালা ওদিকে চাইলেন।

তারপর কাগজের আড়ালে ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন, "তাহলে সাতাশে দিন ফেলি? অফিস থেকে ছুটি দেবে তো ক'দিন?"

শশাঙ্ক মুখ না বার করে গম্ভীর গলায় বললো, "দেবে।"

শশীবালা সন্তুষ্টচিত্তে রান্নাঘরে ফিরে গেলেন। তোলা উনোন জ্বালাবার সাজসরঞ্জাম রেডী করে কচুরির ময়দা মাখতে বসলেন। শশাঙ্ক কলাই ডালের কচুরি খেতে বড় ভালবাসে। সকালে বুলু ডাল বেটে পুর তৈরী করে দিয়ে গেছে। এখন লেচি কেটে সেই পুর ভরে কচুরি বেলে ভাজতে হবে শুধু। শশাঙ্ক বাথরুমে গা ধুতে গেছে। অনেক্ষণ হল ঢুকেছে, এখুনি বেরোবে বোধহয়। শশীবালা উনোন ধরিয়ে পিঁড়ি পেতে চাকি বেলুন তেলের সরা এনে সাজিয়ে রাখলেন হাতের কাছে। কেটলিতে চায়ের জল দিলেন মেপে। খানিক বাদে উনোন ধরলে

কড়াই চাপিয়ে তেল গরম করলেন। তারপর একটা দু'টো করে কচুরি বেলে ছাড়তে লাগলেন তেলে।

আজ বহুদিন পরে তাঁর মন বড় হালকা লাগছে। বিষাদের মেঘ কেটে নতুন অরুণোদয় ঘটবে তাঁর এই ছোট্ট সংসারে। শুভ্রাকে আসার জন্যে চিঠি দেবেন কালই। সাতাশে বিয়ে আর আজ হল মাসের পয়লা। কেনাকাটা,বরযাত্রী কে কে যাবে, আত্মীয় কুটুম্ব কে কোথায় আছে সবার ঠিকানা জোগাড় করে নেমন্তন্ন পাঠানো এবং স্থানীয় যারা তাদের নিজের গিয়ে বলে আসা, বৌভাতের আয়োজন - মেয়ে জামাই এলে তবেই এ সব কাজে হাত দেওয়া যাবে। ছেলে তো এমনিতেই কাছাআলগা মানুষ তায় বউমা গিয়ে অবধি কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। ও যে বিয়েতে মত দিয়েছে সেই ঢের। বিয়ের খাটাখাটনিতে তার সহযোগিতা মোটেই প্রত্যাশা করেন না শশীবালা।

চায়ের জল টগবগ করে ফুটছে সমানে। ভাজা কচুরিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেল বোধহয়। শশীবালা ব্যস্ত হয়ে উঠোনে নামলেন। কলের জলের অবিশ্রান্ত আওয়াজ ছাড়া আর কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বাথরুম থেকে। হঠাৎ সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এলো তাঁর, আর এক সন্ধ্যার কথা মনে করে।

অশক্ত পা দুটিকে যথাশক্তি বেগে চালনা করে বাথরুমের দরজার কাছে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকলেন, "শঙ্কু, শঙ্কু!"

জলের একটানা কলকল শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। শশীবালা কাঠের দরজার উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন।

দু'হাতে দুমদাম করে আঘাত করতে করতে কেঁদে উঠলেন, "ও শঙ্কু, ও খোকা, দরজা খোল বাপ!"

ভিতরে জলের শব্দ থেমে গেল। খড়াৎ করে ছিটকিনি সরানোর আওয়াজ। দরজার পাল্লা দুটি খুলে শশাঙ্ক বাইরে এসে দাঁড়ালো।

"কি হল, এত হাঁকডাক কিসের?"

সদ্য-স্নাত অনাবৃত সুঠাম বক্ষে ফোঁটা ফোঁটা জল চিক চিক করছে। পরনে পাটভাঙা শ্বেতশুভ্র পাজামা। সর্বাঙ্গ দিয়ে দামী সাবানের সুস্নিগ্ধ

গন্ধের মিষ্টি আমেজ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। ছেলের দিকে তাকিয়ে শশীবালার বুক জুড়িয়ে গেল যেন। ক্ষণপূর্বের অমঙ্গল চিন্তার স্মৃতিতে তাঁর কণ্ঠস্বর বুঁজে এলো।

চেষ্টাকৃত লঘু ব্যগ্রতার স্বরে বললেন, "কত চান করবি, কচুরিগুলো নেতিয়ে গেল যে!"

শশাঙ্ক প্রশান্ত কণ্ঠে বললো, "চল, আসছি।"